বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খাবার

হাসান নীল

আজকাল নারীরা বিশেষ কোনো খাবার তৈরি করতে গেলে হরেক রকম উপকরণ দিয়ে এলাহী কাণ্ড বাধিয়ে বসেন। অন্যদিকে একসময় গ্রামের নারীরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়ে বানাতেন মুখরোচক খাবার। যা সবাই মজা করে খেত। এমনকি অতিথির আপ্যায়নের ব্যবহার হতো। কালের আবর্তে বদলে গেছে অনেক কিছু। প্রায় বিলুপ্তির পথে গ্রামীণ খাবার। চলুন জেনে নেওয়া যাক গ্রামের বিলুপ্তপ্রায় সেসব খাবার সম্পর্কে।

কড়কড়া ভাত

আমাদের প্রধান খাবার ভাত। তবে শুধু প্রয়োজনে না, আয়োজন করেও গ্রামবাংলার মানুষজন ভাত খেত। যেমন কড়কড়া ভাতের কথা বলা যায়। এটি খাওয়া হতো শীতকালে। তখনও তিন বেলা গরম ভাত খাওয়ার রীতি আসেনি। এ বেলার খাবার খাওয়া হতো ওবেলায়। প্রথা অনুযায়ী রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার রেখে দেওয়া হতো সকালের জন্য। গরমকালে পচনের হাত থেকে বাঁচাতে পান্তা করে সংরক্ষণ করা হতো। তবে শীতে এসব ঝক্কি পোহাতে হতো না। শীতের সকালে বেঁচে যাওয়া ভাত ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে থাকত। এই ভাতকেই বলা হতো কড়কড়া ভাত। পরিবেশন করতে তেমন জোগাড়যন্ত্র করতে হতো না। গোটা দুয়েক শুকনা মরিচ, সরিষার তেল, রসুন পেঁয়াজ হলেই চলে। মরিচ পুড়িয়ে সঙ্গে পেঁয়াজ ডলে সরিষার তেলে ভর্তা করা হতো। একসময় এই ভাত খেতে কাড়াকাড়ি লাগত। মা চাচি কিংবা দাদি যখন কড়কড়া ভাত মাখতেন তখন চারপাশ ঘিরে থাকত কিশোর কিশোরীরা।

সেওইয়ের নাস্তা বা সেওই

আরও একটি বিলুপ্তপ্রায় খাবার হচ্ছে সেওইয়ের নাস্তা। একে অনেক অঞ্চলে হাতে কাটা সেমাইও বলে থাকে। বাজার থেকে কিনতে পাওয়া প্যাকেটজাত সেমাই কিংবা লাচ্ছার দাপটে আজ অনেকটা কোণঠাসা এই হাতে কাটা সেমাই। তবে এক সময় বেশ চাহিদা ছিল এর। মা চাচি দাদিরা বেশ আয়োজন করে বানাতেন। হাতে কাটা সেমাই বা সেওইয়ের অন্যতম উপাদান চালের গুঁড়া। প্রথমে চালের গুঁড়া পানিতে সেদ্ধ করে খামি বানানো হয়। তারপর সেই খামি চিকন করে কাটা হয়। এরপর তা পিঁড়ির ওপর রেখে হাত দিয়ে ডলে বানানো হয় সেমাই। দেখতে তা অনেকটা টুথপিকের মতো। দুপাশ সরু আর মাঝখানে মোটা। এই সেমাই বানানো হলে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তী সময়ে ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে গুড় নারকেল দিয়ে রান্না করা হতো।

চালের নাস্তা

বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম চালের নাস্তা। একে গরিবের পায়েশও বলা হতো। এক সময় গ্রামের স্বল্প আয়ের মানুষ মিষ্টিমুখ করতে চালের নাস্তা বেছে নিত। এটি বানাতে হয় আখের গুড়, দুধ, চাল ও নারকেল দিয়ে। ভাতের চাল দিয়ে রান্না করা হয় চালের নাস্তা। এতে নারকেল ছোট ছোট টুকরা করে কেটে দেওয়া হয়। সঙ্গে আখের গুড়। চাইলে দুধও দেওয়া যেতে পারে। এই খাবার সুগন্ধিযুক্ত করতেও ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক উপাদান। গ্রামগঞ্জে এক ধরনের পাতা রয়েছে। যেগুলো থেকে পোলাওয়ের মতো সুগন্ধ ছড়ায়। সে কারণে একে পোলাও পাতা বলা হয়। দেখতে অনেকটা আনারসের পাতার মতো। চালের নাস্তা চুলা থেকে নামানোর কিছুক্ষণ আগে এই পাতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পিটুলি বা পিঠালু

আজকাল আধুনিক নারীরা সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে কত কিছু ব্যবহার করেন। খাঁটি গাওয়া ঘি বাসমতি চালসহ হরেক রকম নামিদামি পণ্য। সেগুলো কিনতেও খরচ হয় অনেক টাকা। অথচ এক সময় গ্রামের নারীরা হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়েই তৈরি করতেন সুস্বাদু খাবার-দাবার। এমনই

একটি বিলুপ্ত প্রায় খাবার পিটুলি বা পিঠালু। ছোট ছোট চিংড়ি, মূলা শাক কিংবা মটর শাক দিয়ে বানানো হয় এটি। সঙ্গে দেওয়া হয় চালের গুঁড়া। রান্না শেষে বেশ আটার খামির মতো ঘন ও ভারী হয়। বিলুপ্তপ্রায় অন্য খাবারের তুলনায় পিঠালু এখনও বেশ প্রচলিত। তবে আগের মতো নয়।

লাউয়ের খাট্টা

গ্রামীণ খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম লাউয়ের খাট্টা। এ নিয়ে মুখরোচক গল্পও প্রচলিত আছে। এক তোতলা মেয়ের বিয়ের গল্প। মেয়েটিকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে। কথা আটকে যায় বলে আগেই থেকেই পাত্রীকে বাড়ির লোকজন সতর্ক করে রেখেছিল। পাত্রপক্ষের সামনে টুঁ শব্দটি যাবে না। সেই মতোই চলছিল সব। পাত্রপক্ষের সামনে মেয়ের সুনাম ও গুণের কথা বলছিলেন তার দাদি। কিন্তু পাত্রী যে ভালো খাট্টা রান্না করতে পারে সেটি বললেন না দাদি। এতে আর সংবরণ করতে পারল না মেয়েটি। গলা উঁচিয়ে বলল, দাদি ও দাদি আমি যে খাট্টা রানতে পারি তা তো বললে না। গল্প শুনেই বোঝা যায় খাবারটি একসময় কত জনপ্রিয় ছিল। যদিও এখন গ্রামের অনেকেই ভুলে গেছেন খাট্টার কথা। বয়োবৃদ্ধ ছাড়া এর রন্ধন প্রণালিও ভালো করে জানেন না অনেকে।

আলুর নাস্তা

হারিয়ে যেতে বসা জনপ্রিয় আরেকটি খাবার আলুর নাস্তা। এটি মিষ্টি আলু দিয়ে বানানো হয়। বহু বছর ধরে গ্রামের মানুষের প্রিয় ছিল খাবারটি। প্রথমে মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে নিতে হয়। এরপর খোসা ছাড়িয়ে ভর্তা করা হয়। এবার প্রয়োজন হয় মুড়ি ভাজার ঝাঁজরের মতো একটি পাত্র। তবে ফুটাগুলো ঝাঁঝরের চেয়ে একটু বড় হতে হবে। পাত্রটির উল্টো করে রেখে তার ওপর ভর্তা করা আলু চাপ দেওয়া হয়। এতে করে ছিদ্র দিয়ে আলু ভর্তা ঝুরি আকারে পড়ে। ঝুরি রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পরে সেগুলো বালি দিয়ে ভেজে নিলেই হয়ে গেল আলুর ঝুরি।

কাউনের নাস্তা

এক সময় ধান গমের পাশাপাশি কাউনের চাষ করা হতো। প্রয়োজনীয়তাও ছিল তখন। আগেকার দিনে বছরের একটা সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হতো। সে সময় তিন বেলা ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য হতো না খেটে খাওয়া মানুষজনের। বাধ্য হয়ে খেতে হতো কাউনের চাল। আবার বিভিন্ন সময় কাউন দিয়ে তৈরি করা হতো বিভিন্ন মজাদার খাবার। এর মধ্যে অন্যতম কাউনের নাস্তা। এটি প্রায় বিলুপ্ত এখন। এ প্রজন্মের সঙ্গে তেমন চেনা-জানা নেই বললেই চলে। কাউনের নাস্তা তৈরি হতো আখের গুড় দিয়ে। শুরুতে কাউনের চাল দিয়ে ভাত রান্না করতে হয়। এরপর চাল সিদ্ধ হলে পরিমাণমতো গুড় ও দুধ দেওয়া হতো। পাশাপাশি তেজপাতা দারুচিনি এলাচ মেশানো হতো। দুধ মসলা মিশে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ চুলায় রেখে দিতে হতো। এরপর পরিবেশনের পালা। একটা সময়ের বেশ চাহিদা ছিল এর।

ডইল্যা পোড়া

আজকাল গমের খুব একটা চাষাবাদ হয় না। ফলে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে ডইলা পোড়া নামে একটি খাবার। এটি গম দিয়ে বানানো হতো। গরমের শুরুর দিকে এর বেশ চাহিদা থাকত। গমের আটা পানিতে সেদ্ধ করে লবণ মরিচ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নেওয়া হতো। এরপর হাতের তালুতে নিয়ে গোলাকার রূপ দেওয়া হতো। বলটি কলাপাতায় মুড়িয়ে রান্না শেষে চুলার ছাইয়ের ভেতর ডুবিয়ে রাখা হতো। বেশ খানিকক্ষণ পোড়ার পর লাল রঙ ধারণ করলে আটার বলটি বের করে আনা হতো। এভাবেই বানানো হতো ডইল্যা চোরা।

চাপড়া

বিলুপ্তপ্রায় আরও একটি খাবার হচ্ছে চাপড়া। এটি রুটি জাতীয় খাবার। এক সময় গ্রামে ঘরে ঘরে চাপড়া বানানো হতো। এ খাবার বানাতে হয় গমের আটা দিয়ে। প্রথমে আটা পানিতে সেদ্ধ করতে হয়। এরপর তার সঙ্গে পেঁয়াজ মরিচ মিশিয়ে তাওয়ায় হাত দিয়ে রুটির মতো চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় চাপড়া।

আজকাল গ্রামগঞ্জে এই খাবারগুলোর প্রচলন নেই বললেই চলে। শহুরে খাবারের আগ্রাসনে হারিয়ে গেছে প্রায়। তবু মনে পড়লে ফিরে আসে শৈশব স্মৃতি। হঠাৎ কোথাও চোখে পড়লে জিভে আসে জল।